হিজড়া জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত আচার অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা : একটি নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন*

মোঃ ফারুক শাহ**

মোঃ রবিউল হক***

সার-সংক্ষেপ

আমাদের সমাজে হিজড়া পরিচয়ে কিছু মানুষের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। হিজড়া মূলত তাদেরকেই বলা হয় যাদের লিঙ্গ সম্পর্কে সঠিক ও নিশ্চিত ধারণা পাওয়া যায় না। আপাতদৃষ্টিতে তাদের আচার-আচরণ কখনো পুরুষ আবার কখনো নারীর ন্যায় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের মানসিকতা, চাহিদা ও আচার-আচরণ অনেক ক্ষেত্রে বিপরীতধর্মী হয়ে থাকে। অঞ্চলভেদে তাদেরকে 'কিননার', 'আরাভানি', 'জেনানা', 'কোতি' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। তবে বাংলাদেশে তারা সাধারণত 'হিজড়া' বা 'কোতি' নামে সবার কাছে পরিচিত। ফারসি শব্দ 'হীজ' হতে 'হিজড়া' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে নপুংসক, ক্লীব, একইদেহে স্ত্রী ও পুংচিহ্নযুক্ত মানুষ। অর্থাৎ হিজড়ারা হচ্ছে নপুংসক, ক্লীব, বৃহন্নলা, খোঁজা বা পৌরুষহীন ব্যক্তি যে পরিপূর্ণ একজন পুরুষও নয়, আবার নারীও নয়। তাদের নারী বা পুরুষের ন্যায় সুস্থ যৌনাঙ্গ নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, যৌনাঙ্গের গঠনে ত্রুটি, সেক্স ক্রোমোজোমের সমস্যা, হরমনের তারতম্য এবং আরও বিভিন্ন কারণে একটি শিশু হিজড়া হয়ে জন্মাতে পারে। শিশুটি বয়স বাড়ার সাথে সাথে বৃহৎ সমাজ থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং হিজড়া গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে সমাজের কাছ থেকে তারা তেমন শ্রদ্ধা, সম্মান ও নিরাপত্তা পায় না। এ কারণে তারা নিজস্ব সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক জীবন, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সর্বোপরি নিজস্ব জীবনবোধ গড়ে তুলেছে।

হিজড়াদের আচার-অনুষ্ঠান আমাদের মূলস্রোতের জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় ভিন্ন। তাদের সার্বিক জীবন ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিতে আচার-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ব্যাপক। কেননা এসকল আচার-অনুষ্ঠানের সাথে হিজড়াদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রথা, বিশ্বাস, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রকৃত ও বাস্তব জীবনপ্রণালী জানতে হলে তাদের মধ্যকার প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত অর্থ জানা অপরিহার্য। তাই বর্তমান প্রবন্ধে হিজড়া জনগোষ্ঠীর পালনীয় নানা আচার-অনুষ্ঠানের প্রকৃতি এবং এসব অনুষ্ঠানের সাথে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক ও তাৎপর্য তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে। সুতরাং বর্তমান প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে হিজড়া জনগোষ্ঠীর আচার-অনুষ্ঠান তথা তাদের নিজস্ব জীবনবোধ সম্পর্কে জানতে সংশ্লিষ্ট গবেষক, প্রতিষ্ঠান, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে সহায়তা করবে।

---

* অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

** খণ্ডকালীন শিক্ষক, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

*** সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, হাকীমপুর ডিগ্রী কলেজ, দিনাজপুর

Abstract

In our society there are some minority people who are known as transgender. Those people are called transgender who do not have the exact sexual identity. By observing the behavior, mentality, physical traits and psychological expectation it is very confusing and challenging to identify their sexual and gender traits as they have both the traits and in many instances they act as females but with many traits of males.

Due to regional differences, the transgender people are known either as 'Kinner', or 'Aravani', or 'Jenana' or 'Koti'. But in Bangladesh in general the transgender people are known either as 'Hifra' or 'Koti'. The word 'Hijra' has derived from the Prision word 'Heej' means either without having any sex organ, i.e., 'kleeb' or having the presence of both male and female sex organs. Therefore these people are called as either 'nopungsha', or 'kleeb', or 'breehonla' or 'khoja' or 'pourushheen' person who is neither treated as a male or a female. The transgender people do not have any active male or female sex organ. According to the professional physicians, due to the defects in the physiological constitution of sex organ or prevalence of problems with genetic make-up of chromosome, imbalance in the composition of hormone, a child might have the defect in genetic construction of sexual organ during the development stage of fetus. With the growing stage, when the children's sex and gender identity are found defective, are rather compelled to be isolated from the greater community and society and became confined as a member of 'hijra' community. Due to this kind of isolation and alienation process, they are unable to get any respectful and secured identity within the society. As a consequence, they are rather complelled to develop their own world by creating their own socio-political, cultural, religious customs, rituals, and lifestyle.

The type of customs, rituals and tradition of Hijra people are quite different from the main stream Bengali community. It their overal socio-political and economic life, the importance of traditional culture, customs, rituals and performances have immense value. The Hijra community people mainly survive by practicing their traditional rituals, customs, beliefs, religious, social and economic tradition as all these traits are related to their means of livelihoods. Therefore, this article attempted to analyze the nature and the means of livelihoods and challenges of Hijra community in the context of their own cultural and social rutuals, performances, customs, beliefs and tradition.

হিজড়া বিষয়ক গবেষণা

বাংলাদেশের হিজড়াদের নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোন গবেষণা এখনো সম্পন্ন হয়নি। তবে সম্প্রতি এস.এ.এম. হুসাইন *তৃতীয় প্রকৃতি* (২০০৫) নামক গ্রন্থে বাংলাদেশের হিজড়াদের আর্থ-সামাজিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তবে ভারতের হিজড়াদের নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কাজ করেন শেরেনা নন্দা। তিনি তাঁর *Neither Men nor Women* (১৯৯৮) গ্রন্থে হিজড়াদের জীবন-ব্যবস্থার সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন। একই ভাবে অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু ভারতীয় হিজড়া সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে *ভারতের হিজড়ে সমাজ* (১৯৯৭) নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং তুলে ধরেন বৃহত্তর সমাজ কিভাবে হিজড়াদের বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবন যাপনে বাধ্য করে। তবে হিজড়াদের ধর্ম সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান ও এগুলোর সাথে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করেন নীহার মজুমদার যা পরবর্তীতে *হিজড়ে সমাজ – মানবিক অনুসন্ধান* (২০০৫) নামে প্রকাশিত হয়।

গবেষণা পদ্ধতি

মানব সমাজ ও সংস্কৃতি গবেষণার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এ সকল পদ্ধতির মধ্যে নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি অন্যতম। এ পদ্ধতির প্রধান কৌশল হচ্ছে গবেষককে গবেষণাধীন জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক বা প্রচলিত জীবনধারার সাথে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।[১] বর্তমান গবেষণায় হিজড়াদের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান জানার জন্য নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতির সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষক নিম্নোক্ত কৌশল অনুসরণ করেছেন।

ক. হিলির হিজড়া জনগোষ্ঠীর সাথে এক বছরেরও অধিক সময় ধরে বসবাস।

খ. তাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন।

গ. হিজড়াদের নিজস্ব ভাষা আয়ত্তকরণ ও কিছু কিছু দোভাষীর ব্যবহার।

ঘ. অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

ঙ. হিজড়াদের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ।

চ. বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রধান তথ্যদাতা বিশেষ করে গুরুমার বিবরণ গ্রহণ ও যাচাইকরণ এবং

ছ. হিলিতে বসবাসকারী হিজড়াদের সংখ্যা, শ্রেণী, ধর্ম, আয়, জীবনমান ইত্যাদি জানার জন্য গৃহজরিপ করা হয়েছে।

এছাড়া তথ্য সংগ্রহের জন্য মাধ্যমিক উৎস হিসাবে স্থানীয় সংস্থা CEDR ও বিভিন্ন গ্রন্থ, গবেষণাপত্র ও প্রবন্ধের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। গবেষণা এলাকা থেকে তথ্যসংগ্রহ করা হয়েছে ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত।

গবেষণা এলাকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ঢাকা, দিনাজপুর, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় হিজড়াদের বসবাস করতে দেখা যায়। তবে বর্তমান গবেষণার মাঠকর্মের জন্য দেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর জেলার হিলি এলাকাকে নির্বাচন করা হয়েছে। এই এলাকা নির্বাচনের প্রধান কারণ হচ্ছে হিজড়ারা বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করলেও এখানে অন্যান্য এলাকার তুলনায় বেশি সংখ্যক হিজড়া একত্রে বসবাস করে। তবে ভারতের ন্যায় এখানে নির্দিষ্ট কোন হিজড়া পল্লী এখনো গড়ে উঠেনি। হিলি মূলত একটি স্থল বন্দর। এখানে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও রপ্তানি হয়ে থাকে।[২]

এ এলাকায় বসবাসকারী অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অন্যরা হিন্দু ও খ্রিস্টান। ভারত থেকে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি করা এখানকার অনেকের মুখ্য পেশা। তবে কেউ কেউ চাকুরি ও কৃষির উপর ভিত্তি করে জীবনযাপন করে। অন্যদিকে, এখানে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বসবাসরত হিজড়ারা সাধারণত ভারতীয় পণ্যের

চোরাচালান ব্যবসা, যৌনকর্মী, বাচ্চা নাচানো ইত্যাদি পেশার সাথে সম্পৃক্ত থেকে জীবন নির্বাহ করে। বেসরকারি সংস্থা CARE-এর অর্থায়নে ২০০৪ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত একটি স্থানীয় সংস্থা CERD এখানে হিজড়াদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে। এক্ষেত্রে সংস্থাটি অনেকাংশে সফলও হয়েছে। গৃহজরিপে দেখা যায়, হিলিতে স্থায়ীভাবে ৫০ জন এবং অস্থায়ীভাবে ৫০ জন হিজড়া বসবাস করে। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে অধিকাংশ এলাকায় একসাথে ১০/১৫ জনের বেশি হিজড়াকে বসবাস করতে দেখা যায় না। যাহোক, হিলিতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ৫০ জন হিজড়ার মধ্যে অধিকাংশই পার্শ্ববর্তী জেলা দিনাজপুর, নওগা, বগুড়া ও নীলফামারী থেকে আগত। সমীক্ষায় দেখা যায়, ৪৪ ভাগ মধ্যবিত্ত, ৪৬ ভাগ নিম্নমধ্যবিত্ত এবং ১০ ভাগ নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আগত বলে তথ্য প্রদান করে। তবে বর্তমানে বসবাসের স্থান, আয়ের উৎস ও পরিমাণ, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে স্থানীয় প্রেক্ষাপটে তাদের অধিকাংশকেই নিম্নমধ্যবিত্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

আমাদের উপমহাদেশে হিজড়ারা সাধারণত 'তৃতীয় লিঙ্গ' হিসাবে পরিচিত। অর্থাৎ তারা একজন মেয়েও নয়, আবার পুরুষও নয়।[৩] হিজড়া সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব প্রথম কোথায় ও কখন দেখা যায় তা নির্দিষ্ট করে বলা বেশ কঠিন। এমনকি ইতিহাসে যে সকল খোজা সম্পর্কে জানা যায়, তাদের সাথে বর্তমান হিজড়াদের একটি ভাগ তথা খোঁজা বা ছিন্নিরা পুরোপুরি একই কিনা– এ নিয়ে সামাজিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ মতপার্থক্য রয়েছে। তবে দৈহিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার দিক থেকে এদের মধ্যে কিছুটা মিল লক্ষ করা যায়। কেননা একটি সুস্থ ব্যক্তিকে খোঁজা করার পর (জোর করে) তার শারীরিক অবস্থা ও হিজড়াদের মধ্যে যে খোজা হয় (জোরকৃত বা ইচ্ছাকৃতভাবে), তার শারীরিক অবস্থা একই হয়ে থাকে। জৈবিক দিক থেকে তারা তাদের সুস্থ যৌনাঙ্গ হারিয়ে ফেলে। কাজেই এই প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে খোজাদের সাথে হিজড়াদের একটি দল তথা ছিন্নি বা খোজাদের কিছুটা মিল বিরাজমান। এমনকি আমরা আমাদের গবেষণাধীন এলাকার কয়েকজন গুরুমার সাথে এ বিষয়ে কথা বললে তারাও খোজা বা ছিন্নিদের সাথে ঐতিহাসিক খোজাদের সম্পর্কে একইভাবে আলোকপাত করেন। যাহোক, খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে এশিয়া মাইনর আসিরীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে আসিরীয়রা যুদ্ধবন্দি দাসদের শাস্তিস্বরূপ খোজা করে প্রথম এই খোজাকরণ প্রথার সূচনা করেন।[৪] ধীরে ধীরে এই শাস্তি তাদের সমাজে অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। ঠিক সেই সময়ে এই অঞ্চলের ধর্মীয় পুরোহিতরা পুণ্য অর্জনের জন্য স্বেচ্ছায় নিজের পুরুষাঙ্গ ছেদন করে চিরতরে নপুংশকে রূপান্তরিত হত। তাদের ধারণা ছিল, এই রূপান্তরের মাধ্যমে তারা নিজেদের আরো বেশি সৃষ্টিকর্তার প্রতি উৎসর্গ করতে সক্ষম হবে। এদের মাথার চুল ছিল লম্বা এবং তারা নারীদের ন্যায় পোশক পরিধানে অভ্যস্ত ছিল। ফলে বাহ্যিকভাবে তাদেরকে নারীর ন্যায় মনে হত। ধীরে ধীরে পুরোহিতদের এই বিশ্বাস ও আচরণ পারস্যে ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে গ্রীস ও পরে রোমে এর বিস্তার ঘটে। বাণিজ্যসূত্রে রোম ও চীনের যোগাযোগের কারণে চীনেও এই প্রথার ব্যাপ্তি ঘটে। এমনকি চীনের সম্রাট য়ুয়ান-তির সময়কালে খোজারা রাজদরবারে গুরুত্বপূর্ণ পাহারার দায়িত্ব পালন করত। খোজারা ছিল সম্রাটের অতি বিশ্বস্ত ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন। ভারতবর্ষে খোজাকরণ প্রথার প্রথম সূত্রপাত ঘটে মৌর্যকালে।[৫]

মুসলমান শাসনামলে এ অঞ্চলে খোজাদের সংখ্যা সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে অনেক হাবশিকে এ সময়কালে খোজা করে রাজদরবারের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করা হয়। এমনকি ইতিহাসের পরিক্রমায় ১৪৮৭ থেকে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই উপমহাদেশে হাবশি রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে প্রথম সুলতান বারবক শাহ খোজা হিসেবে রাজত্ব পান। সেই সময় আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খোজাদের ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আমাদানি করা হয়। ফলে এই সময়কালে বিভিন্ন রাজ্যে খোজাদের সংখ্যা ও প্রভাব বেড়ে যায়। পরবর্তী সময়ে মুঘল আমলেও রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন কাজে খোজাদের ব্যবহার করা হত। এ প্রসঙ্গে মজুমদার ও বসু বলেন,[৬] "মুঘল আমলে পাল্কী বাহকদের পথপ্রদর্শক ও রক্ষী হিসাবে নিয়োজিত ছিল খোজারা"। পাশাপাশি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের যৌন চাহিদা মেটানোর জন্য

খোজাদের পাঠানো হত। খোজাদের নারী ভেবে সৈন্যরা সহবাসে লিপ্ত হত।[৭] সুতরাং বাংলাদেশসহ সমগ্র ভারতবর্ষে হিজড়াদের অস্তিত্ব যে দীর্ঘকাল থেকে বিরাজমান তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এদের রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী নানা আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথা, যা তাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। তবে পূর্বে এরা রাজঅন্তঃপুরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলেও সময়ের পরিবর্তনে তাদের অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। ধীরে ধীরে এরা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে শুরু করে। ফলে তাদের ঐতিহ্যবাহী জীবধারায় ও সংস্কৃতির মাঝে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পরিবর্তিত জীবনব্যবস্থার কিছুটা প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবে বর্তমানে সারা বিশ্বের হিজড়াদের প্রকৃত সংখ্যার যেমন কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই, তেমনি বাংলাদেশে হিজড়াদের প্রকৃত সংখ্যা কত তা জানা বেশ কঠিন। কেননা তাদের ওপর সুনির্দিষ্ট কোন পরিসংখ্যান বা তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি। বাংলাপিডিয়ার তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের হিজড়াদের সংখ্যা আনুমানিক ৩০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ জন।[৮]

হিজড়াদের শ্রেণীবিভাগ : হিজড়াদের ভাষ্যানুযায়ী, তারা প্রধানত দুভাগে বিভক্ত। এই দুভাগের মধ্যে আবার কয়েক ধরনের উপবিভাগও রয়েছে, যা নিম্নরূপ :

১. প্রকৃতিগত বা জন্মগত যৌন প্রতিবন্ধী হিজড়া : জন্মগতভাবে এরা যৌন প্রতিবন্ধী। সারা পৃথিবীতে এদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

২. ছদ্মবেশী হিজড়া : এরা জন্মগতভাবে যৌন প্রতিবন্ধী নয়। তা সত্ত্বেও এরা প্রকৃতিগত হিজড়ার ন্যায় জীবন যাপনে অভ্যস্ত বা অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তাই এরা ছদ্মবেশী হিজড়া নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে হিজড়া সমাজে এদের সংখ্যাই বেশি। এদের আবার চারভাগে ভাগ করা যায়, যথা :

ক. আকুয়া : হিজড়াদের মধ্যে কেউ কেউ মেয়ের ন্যায় সাজতে বা মেয়ে হিসেবে থাকার মধ্যে পরম মানসিক পরিতৃপ্তি বোধ করে। এরাই আকুয়া হিসেবে পরিচিত।

খ. জেনানা : সাধারণত যেসব হিজড়া নারীর পোশাক পরিচ্ছদ পরতে ও নারীর ন্যায় আচরণ করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে সেসব হিজড়া জেনানা বলে বিবেচিত হয়। জেনানাদের আবার দুভাগে ভাগ করা যায়; যথা– পৌরুষহীন জেনানা ও যৌনক্ষমতা সম্পন্ন জেনানা। পৌরুষহীন জেনানাদের শারীরিক সমস্যা থাকলেও যৌনক্ষমতাসম্পন্ন জেনানাদের কোন শারীরিক ত্রুটি দেখা যায় না।

গ. ছিবড়ি : বাহ্যিকভাবে দৈহিক কাঠামোর দিক থেকে নারীর ন্যায় হিজড়া খুবই কম দেখা যায়। এ সকল নারীর ন্যায় হিজড়া তাদের সমাজে 'ছিবড়ি' নামে পরিচিত।[৯] ছিবড়ি হিজড়াদের আবার দুভাগে ভাগ করা যায়, তা হল স্থায়ী ছিবড়ি ও অস্থায়ী ছিবড়ি।

ঘ. ছিন্নি : হিজড়াদের মধ্যে আকুয়া বা জেনানারা কখনো কখনো তাদের পুরুষাঙ্গ ছেদন করে একজন পূর্ণাঙ্গ ও প্রকৃত হিজড়া হিসেবে পরিচিতি পেতে চায়। তাই এরা নিজের পুরুষাঙ্গ ছেদন করে। এরা ছিন্নি নামে পরিচিত। এই ছেদন-প্রক্রিয়া অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক ও ঝুঁকিপূর্ণ।

আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা : যে কোন সমাজ বিশ্লেষণের মূল ভিত্তি হচ্ছে সে সমাজের প্রচলিত বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানকে ব্যাখ্যা করা। কেননা সেই সমাজের বাস্তব অবস্থা ও চিত্র বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। তাই দেখা যায়, কোন সমাজের পরিবর্তন বলতে সংশ্লিষ্ট সেই সমাজের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন ও চর্চার মধ্যে পরিবর্তনকে বোঝায়। যে কোন সমাজের পালনীয় বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানকে অতিপ্রাকৃত শক্তির আলোকে বিবেচনা না করে বরং তা সামাজিক একাত্মতার শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।[১০] বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে বসবাসকারী মানুষ শুধু অতিপ্রাকৃত শক্তির বিশ্বাসকে বিবেচনা করে না, বরং সমাজের বিভিন্ন সামাজিক বিষয়াবলির সম্পর্ক ও সহাবস্থানকে প্রাধান্য দেয়।

কাজেই সমাজভেদে মানুষ বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে তার সম্প্রদায়গত ও সংগঠনগত সংহতিকে তুলে ধরে। আর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে এই সংহতি আরো দৃঢ় হয়ে থাকে।[১১] মানুষ সামাজিক প্রাণী হিসেবে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের চর্চা ও পালনের সাথে সম্পৃক্ত। মেরি ডাগলাস বলেন,[১২] "সামাজিক প্রাণী হিসাবে মানুষ আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন প্রাণী"। তবে সমাজ ও সংস্কৃতিভেদে মানুষের পালনীয় আচার-অনুষ্ঠানের সম্পর্ক ও তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই বিশেষ কোন নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সমাজ ও সংস্কৃতির আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। অন্যদিকে সমাজের বাস্তবতার অংশ হিসেবে ধর্মের সাথে আচার-অনুষ্ঠানের গভীর সম্পর্ক বিরাজমান।[১৩] কেননা অতি প্রাকৃত শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও কল্যাণকর করার উপায় হল এ সকল আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তা লালন করা। তাই বলা যেতে পারে এ সকল বিশ্বাস ও ক্রিয়ার ফলাফল হল আচার-অনুষ্ঠান, যার মাধ্যমে কোন জনগোষ্ঠী সামাজিক এবং অতিপ্রাকৃত জগতের মধ্যে একধরনের সেতুবন্ধন রচনা করে।

হিজড়াদের প্রধান প্রধান আচার-অনুষ্ঠান : হিজড়াদের আচার-অনুষ্ঠানসমূহকে মূলত দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা :

(১) পর্যাবৃত্তকালীন আচার-অনুষ্ঠান (Periodic ritual)

(২) অপর্যাবৃত্তকালীন আচার-অনুষ্ঠান (Non-periodic ritual)

পর্যাবৃতকালীন অনুষ্ঠানসমূহের মধ্য অন্যতম হচ্ছে মাজারে ওরস, একাধিক দেবীর পূজো, ঢোল পূজো, বসন্ত উৎসব ইত্যাদি। হিজড়ারা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এগুলো পালন করে থাকে। এ সকল আচার-অনুষ্ঠান তাদের মাঝে বেশ উৎসবের সৃষ্টি করে এবং তারা জাঁকজমকের সাথে তা উদযাপনের চেষ্টা করে।

অপর্যাবৃত্তকালীন অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, খোজাকরণ ইত্যাদি যা বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে বা অবস্থার কারণে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এসব আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিজড়ারা মূলত নিজেদের কল্যাণ ও পারলৌকিক জগতে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা কর। এর ফলে অতিপ্রাকৃত শক্তির সাথে তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সকল আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে দিয়ে হিজড়ারা তাদের সামাজিক অবস্থা ও সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী করে তোলে। তবে হিজড়াদের এ সকল আচার-অনুষ্ঠান প্রথাগতভাবে চলে আসলেও বর্তমানে সময়ের বিবর্তনে কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। যা হোক, এসব আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে হিজড়াদের ঐক্য ও সংহতি ফুটে ওঠে।

প্রচলিত প্রথা : বৃহত্তর সমাজের ন্যায় হিজড়া সমাজেও কিছু আদেশ-নিষেধ প্রচলিত রয়েছে যা প্রত্যেক সদস্যকে মেনে চলতে হয়। প্রথার বাইরে কেউ কোন কাজ বা আচরণ করলে নিয়ম ভঙ্গকারী ঐ সদস্যকে সমাজ থেকে বহিষ্কার বা মোটা অংকের জরিমানা করা হয়। প্রচলিত প্রথার বাইরে কোন কাজ করা অন্যায় ও অগ্রহণযোগ্য। নিয়মানুযায়ী গুরুমা ও অনুসারী শিষ্যদের সুসম্পর্ক বজায় রাখা আবশ্যক। শিষ্যদের কোন সমস্যা হলে গুরুমা তা সমাধান করে দেন। বিনিময়ে শিষ্যরা গুরুমাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রদর্শন ও তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলে। এটা সকল ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত। এছাড়া নিজ সম্প্রদায়ের বাইরেও কারো সাথে খারাপ আচরণ করা হিজড়া সমাজে প্রথাগতভাবে গর্হিত কাজ। গুরুমায়েরা তাদের অবস্থান ও আত্মমর্যাদা সম্পর্কে বেশ সচেতন। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা প্রয়োজন ছাড়া একজন গুরুমা আরেকজন গুরুমার সাথে দেখা করেন না বা মিলিত হন না। আর কোন সদস্য রাস্তা-ঘাটে গুরুমাকে দেখলে তাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে।

হিজড়া সমাজের আরেকটি প্রথা হচ্ছে, নবজাতক জন্মের পর বাচ্চা নাচিয়ে অর্থ উপার্জন করা। এ সময় নাচ-গানের জন্য 'ঢোল' নামক বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে তারা অনুষ্ঠান করে। তাই 'ঢোল' তাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এই ঢোলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কিছু সামাজিক আচার-বিধি। কর্মক্ষেত্র ছাড়া অকারণে গুরুমায়ের সামনে ঢোল বাজালে বা হাতে তালি দিয়ে শিষ্যদের ক্ষতি হবে বলে তাদের মাঝে বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। ঢোল পায়ে লাগাকে প্রচলিত সমাজে পাপ বা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত করা হয়।

বিয়ে : অনেকেই আশ্চর্য হতে পারেন যে, হিজড়াদের মাঝে বিয়ের বিষয়টা কিভাবে আসে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, হিজড়াদের সাথে বৃহত্তর সমাজের অনেক পুরুষের বিয়ে হয়ে থাকে। এ ধরনের বিয়ে শুধুমাত্র আকুয়া, ছিন্নি ও পৌরুষহীন জেনানাদের মাঝে দেখা যায়। বিয়ে উপলক্ষে তেমন কোন আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয় না। অতীতে মাজারে মালা বদলের মাধ্যমে হিজড়াদের বিয়ে সম্পন্ন হত।[১৪] একে অপরের গলায় মালা বদল করলে হিজড়া সমাজে তারা স্বীকৃতি পেত। এরপর উপস্থিত ব্যক্তিদের বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হতো। তবে বর্তমানে বাংলাদেশে হিজড়াদের বিয়ে স্থানীয় গুরুমার সামনে যে কোন জায়গায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যথারীতি মালা বদল করা হয়। বিয়ের সাক্ষী থাকেন গুরুমা ও আরো ২/৩ জন হিজড়া। বিয়ের পর গুরুমা ও উপস্থিত সবাই তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করেন যেন তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। হিজড়া সমাজের নিয়মানুযায়ী, বিয়ের কাজসমূহ সাধারণত রাতে অনুষ্ঠিত ও সম্পন্ন হয়ে থাকে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, বর্তমানে হিজড়াদের সাথে যে সকল বর বা পারিকের (হিজড়া ভাষা) বিয়ে সম্পন্ন হয় তাদের অধিকাংশই বৃহত্তর সমাজের নিম্ন মর্যাদার ও নিম্ন আয়ের অধিকারী। সাময়িক আনন্দ লাভের জন্য তারা (বৃহত্তর সমাজের মানুষ) হিজড়াদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। তবে তা বেশিদিন টিকে না বা স্থায়ী হয় না। যেকোন দিন তারা হিজড়াকে রেখে চলে যায় বা পালিয়ে যায়। হিজড়ারা বিষয়টিতে কষ্ট পেলেও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার চেষ্টা করে। বিয়ের বিষয়টি তাদের মাঝে অলিখিত ও মৌখিকভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে বিধায় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ তারা পায় না।

নতুন পারিকের (জীবনসঙ্গী) আগমন : নতুন পারিকের সন্ধান, আগমন বা সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে হিজড়ারা নিজেদের মধ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যা 'পরিচিতি পর্ব' নামে বিবেচিত হয়। এখানে মূল হিজড়া আর পারিকের সাথে এলাকার অন্য হিজড়াদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। সাধারণত স্থানীয় গুরুমার উপস্থিতিতে রাতে এই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান বা পরিচিতি পর্ব শেষে উপস্থিত হিজড়াদের জন্য বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়। এক উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে হিজড়া ও পারিক তাদের নতুন জীবন শুরু হয়। এসময় সবাই তাদের নতুন জীবনে সুখ ও শান্তির জন্য আশীর্বাদ করেন। উল্লেখ্য কোন সময় তার সঙ্গী ছেড়ে যেতে চাইলে বা চলে গেলে কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না।

নতুন হিজড়া সদস্য গোত্রভুক্তকরণ : নতুন হিজড়া সদস্যের গোত্রভুক্তকরণের ক্ষেত্রে হিজড়ারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে। নতুন হিজড়া সদস্যরা মূলত দু'ভাগে গোত্রভুক্ত হয়ে থাকে, যেমন – (ক) স্বেচ্ছায় যোগাযোগের মাধ্যমে ও (খ) হিজড়াদের শলা-পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে। হজড়ারা একটা নির্দিষ্ট সময়ে বুঝতে পারে যে, তারা সমাজের অন্যান্য সদস্যদের ন্যায় স্বাভাবিক নয়। ফলে তারা বৃহত্তর সমাজের সদস্যদের সাথে বসবাসের চেয়ে হিজড়াদের সাথে বসবাসে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।[১৫] তাই তারা স্বেচ্ছায় হিজড়াদের দলে যোগ দেয়। আবার অনেক হিজড়া বিভিন্ন এলাকায় বাচ্চা নাচানো বা তোলা উঠানোর সময় ছদ্মবেশী হিজড়াদের সনাক্ত করতে পারে। এ সকল হিজড়া সমাজ ও পরিবার পরিজনের ভয়ে হিজড়া হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত হিজড়ারা তাদের শনাক্ত করতে পারে। শনাক্ত করার পর বিভিন্ন শলা পরামর্শ ও বুদ্ধি প্রদানের মাধ্যমে মূল ধারার হিজড়াদের সাথে সম্পৃক্ত করে। এজন্য অবশ্য তাদের বেশ চেষ্টা করতে হয়। তবে এ ধরনের হিজড়াদের প্রথমে বেশ পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখা হয়। এমনকি তাদের নারীর প্রতি আকর্ষণ রয়েছে কিনা সে বিষয়েও খেয়াল রাখা হয়। সবকিছু ঠিক থাকলে গুরুমার মাধ্যমে তার হিজড়া হিসাবে দলভুক্তি নিশ্চিত করা হয়। এই উপলক্ষে তাকে সবার উপস্থিতিতে হিজড়া হিসাবে ঘোষণা দিতে হয় এবং মিষ্টি বা পান খাওয়াতে হয়। নতুন সদস্য দলভুক্তর সময় তাদের মাঝে বেশ আনন্দমুখর পরিবেশ বিরাজ করে।

খোজাকরণ প্রক্রিয়া : হিজড়া সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, খোজাকরণের মধ্য দিয়েই একজন হিজড়া পূর্ণাঙ্গ হিজড়ায় রূপান্তরিত হয়। হিজড়াদের নানা আচার-অনুষ্ঠান মধ্যে খোজাকরণ পর্বটি বেশ কয়েক দিন সময় নিয়ে সম্পন্ন হয়।[১৬] প্রক্রিয়াটি অনেকটা বীভৎস ও ভয়ংকর। আকুয়া ও জেনানা হিজড়ারা সাধারণত ছেদন বা খোজাকরণ

প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে যারা পরবর্তীতে 'ছিন্নি' নামে পরিচিত হয়। একজন কাটানি গুরুর (হিজড়া ভাষা) নেতৃত্বে ৫/৬ জন হিজড়ার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। এই প্রক্রিয়া মূলত দুইভাবে সম্পন্ন করা হয়, যথা : ১) জোরপূর্বক ও (২) ইচ্ছাকৃতভাবে খোজা হওয়া। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে খোজা হওয়ার সংখ্যা খুবই কম। বেশিরভাগ সময়ই তাদের হয় চেতনানাশক ঔষধ সেবন করিয়ে কিংবা জোরপূর্বক এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। খোজা কারার লক্ষ্যে নির্ধারিত ব্যক্তির সাথে হিজড়ারা প্রথমে খুব ভাল আচরণ করে। একটি নির্দিষ্ট ঘরে তাকে খোজাকরণের আগে ১১ দিন রাখা হয়। এসময় তাকে বিভিন্ন মাদকজাতীয় দ্রব্য খাওয়ানো হয়। ছিন্নি হিজড়ারা তাকে নানাভাবে খোজাকরণের সুফল সম্পর্কে অবহিত করে। কিছু কিছু যৌন পরিবর্তনকামী হিজড়া ইচ্ছাকৃতভাবে এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।[১৭] ঘরে রাখা হিজড়াকে নানা চেতনানাশক ঔষধ সেবনের মধ্যে দিয়ে তাকে তমাচ্ছন্ন করে রাখা হয়। ঠিক ১১ দিনের মাথায় কাটানি গুরুর নেতৃত্বে কয়েকজন হিজড়া সেই ঘরে প্রবেশ করে নেশায় আচ্ছন্ন হিজড়াকে হাত-পা বেঁধে দেওয়ালের সাথে শক্ত করে চেপে ধরে। এসময় মুখে কাপড় হয় দেয়া এবং চোখ কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। এরপর কাটানি গুরু অত্যন্ত ধারালো ক্ষুর দিয়ে পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলে। পরিণতিতে তার ছেদনকৃত অঙ্গ থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত হয়। হিজড়াদের বিশ্বাস অনুযায়ী এই রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে শরীরের সমস্ত পুরুষ রক্ত বেরিয়ে যায় এবং সে প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ হিজড়ায় পরিণত হয়। হিজড়াদের মাঝে এটা 'নির্বাণ' নামে পরিচিত। লিঙ্গচ্ছেদের পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়। ক্ষতস্থান থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত একটি পাত্রে জমা হতে থাকে। কেটে ফেলা অঙ্গটিও ঐ পাত্রে রাখা হয়। পরদিন আশেপাশের সকল হিজড়া পাত্রটিকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে গান গাইতে গাইতে কাছে কোন নদী বা পুকুরে তা ভাসিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ২ দিন নতুন ছিন্নিকে ঘুমাতে দেয়া হয় না। তার ক্ষতস্থানে ছাই ও খয়ের দেওয়া হয়। এসময় সার্বক্ষণিক পরিচর্যার জন্য একজন হিজড়া সদস্য তাকে সঙ্গ দেয় যে পরে তার 'পিঠভাই' হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ২ দিন পরে তাকে হালকা খাবার খাওয়ানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় স্পর্শকাতর পুরষাঙ্গ ছেদনের জন্য অনেক সময় অনেক হিজড়া মারা যায় এবং যারা বেঁচে থাকে তাদের অনেকে রক্তশূন্যতা এবং ইনফেকশনে ভোগে।[১৮] বেঁচে থাকলে ৪০ দিন পর এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যা 'পাট্টাভিষেক' নামে পরিচিত।

পাট্টাভিষেক বা জন্মদিন : ছিন্নি হিজড়া সুস্থ হয়ে উঠলে ৪০ দিন পরে ঐ মহল্লার সকল হিজড়া আনন্দ, গান ও বিশেষ উন্নত খাওয়ার আয়োজন করে, যা 'পাট্টাভিষেক' নামে পরিচিত। ঐদিন অঙ্গ ছেদনকৃত হিজড়ার নতুন নাম ও পদবী দেওয়া হয়। তাই সে পূর্বের নাম ও পদবী হারিয়ে ফেলে। সাধারণত ঘি দিয়ে পোলাও ও মাংস রান্না করা হয় এবং নিকটতম ও পরিচিত হিজড়াদের নিমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রথাগতভাবে খোজাকরণের কাজটি হিজড়াদের কাটানি গুরুরা সম্পন্ন করলেও বর্তমানে অনেক হিজড়া এই কাজটি আধুনিক চিকিৎসাগ্রহণ তথা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সম্পন্ন করছে। বিশেষ করে ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে এই সুযোগ থাকায় অনেক বাংলাদেশি হিজড়া সীমান্ত পার হয়ে সেখানে গিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করে। তবে এটা বেশ ব্যয়বহুল এবং অধিকাংশ হিজড়া এধরনের পদক্ষেপ নিতে অপারগ। কিন্তু এতে জীবনের ঝুঁকি অনেক কম।

শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান : হিজড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃত ব্যক্তির সৎকার ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান মূলত নিজ নিজ ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়ে থাকে।[১৯] সাধারণত হিন্দু হলে দাহ ও মুসলমান হলে কবর দেওয়ার প্রথা তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তবে মৃত ব্যক্তিকে পুরুষ নাকি নারী হিসাবে দাফন করা হবে তা মূলত গুরুমা নির্ধারণ করে। ইসলাম ধর্মের অনুসারী হলে মৌলবি ডেকে জানাজা পড়ানো হয়। আর হিন্দু হলে পুরোহিতরা সৎকার সম্পাদন করেন। তবে এক্ষেত্রে সর্বজনীনভাবে হিজড়ারা কিছু রীতিনীতি মেনে চলে যা নিম্নরূপ :

(ক) সৎকার শেষে তারা অশৌচ পালন করে। এক্ষেত্রে গুরুমা ও শিষ্যের ক্ষেত্রে সময়ের ভিন্নতা দেখা যায়। গুরুমা মারা গেলে শিষ্যরা সাধারণত ৪৫ দিন অশৌচ পালন করে। এ সময় তারা রঙিন কাপড় পরিধান করে না। এমনকি তারা সাজগোজ করা থেকেও বিরত থাকে। কোন রকম আনন্দ উল্লাস করে না। ৪৫ দিন পর তারা যথারীতি পূর্বের স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে যায়। কোন শিষ্য মারা গেলে সেক্ষেত্রে মাত্র ৪দিন অশৌচব্রত পালন করা হয়।

(খ) হিজড়া সম্প্রদায়ের নিয়মানুযায়ী হিন্দু মুসলমান সবার ক্ষেত্রে আরেকটি অভিন্ন পালনীয় রীতি হচ্ছে ঠিক ৪০ দিনের শেষে মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধানুষ্ঠান আয়োজন করা। এ রীতি গুরুমা ও শিষ্য উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ সময় পরিচিত আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ জানানো হয়।

(গ) মারা যাওয়ার পর মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনকে খবর দেওয়া হয়। পুরো গোষ্ঠীতে নেমে আসে শোকের বেদনা। এসময় তারা সাধারণত আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও পালাপার্বণ পালন থেকে বিরত থাকে।

(ঘ) পারলৌকিক ক্রিয়াসমূহ পালনের সময় হিজড়া সদস্য ছাড়া বহিরাগত কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এ বিষয়টি মেনে চলা হয়। একই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে তাদের প্রচিলত প্রথা অনুযায়ী পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে দেখা যায় যে, হিজড়া সম্প্রদায়ের কেউ মারা গেলে বৃহত্তর সমাজের সদস্যরা সাধারণত তাকে দেখতে যায় না। তবে যে সকল হিজড়া তাদের বাবা-মা, স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ রাখে বা বসবাস করে, তাদের ক্ষেত্রে সাধারণত বৃহত্তর সমাজের প্রথা অনুযায়ী দাফন সম্পন্ন করা হয়। আর যে সকল হিজড়া বৃহত্তর সমাজে পুরোপুরি একজন 'হিজড়া' হিসাবে পরিচিত হয় এবং যাদের বাবা-মায়ের সাথে যোগাযোগ নেই তাদের ক্ষেত্রে হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাদের দাফন ও অন্য কার্যাদি সম্পন্ন করে।

ধর্মীয় জীবন : সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও উগ্র ধর্মীয় কর্মকাণ্ড যখন আমাদের বৃহত্তর সমাজব্যবস্থার মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, তখন হিজড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক সম্প্রীতির বন্ধন দেখা যায়।[২০] পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এরা সমাজে সৃষ্টি করেছে গভীর ধর্মীয় সহনশীলতাসম্পন্ন মূল্যবোধ, যা এক উদারনৈতিক সংস্কৃতির পরিচায়ক।

হিজড়া সমাজে যে ধর্মীয় জীবনধারা লক্ষ করা যায় তা মূলত মিশ্র ধর্ম হিসাবে বিবেচিত।[২১] মুসলিম ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সাথে হিন্দু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত হয়ে এক বিশেষ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে, যা লক্ষ করলে আমরা মূলত ৪টি ধারায় বিশ্লেষণ করতে পারি।

ক. মাজারকেন্দ্রিক মারফতি সুফি ভাবনা
খ. নিজস্ব দেব-দেবীর পূজো পার্বণ ও ধর্মোৎসবে অংশগ্রহণ
গ. সনাতনী হিন্দু ধর্মাচরণ ও
ঘ. ইসলামি ধর্মানুষ্ঠান পালন।

তবে গবেষণাধীন এলাকার বেশিরভাগ হিজড়াই মুসলমান। তাই তারা ইসলামি ধর্মানুষ্ঠানসমূহকে অধিক গুরুত্ব দেয় এবং পালন করে। অনেক জেনানাই মসজিদে গিয়ে ধর্ম পালন করে। যৌন ক্ষমতাসম্পন্ন জেনানারা বৃহত্তর সমাজের ন্যায় পোশাক পরিধান করে বিধায় তারা মসজিদে প্রবেশ করতে পারে। পক্ষান্তরে, ছিন্নি ও আকুয়ারা সবসময় নারীর ন্যায় পোশাক পরিধান করে বিধায় তারা মসজিদে প্রবেশ করতে পারে না। হিন্দু বা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের নিজ মন্দিরে বা গীর্জায় ধর্ম পালন করতে কোন সমস্যা হয় না।

মাজারকেন্দ্রিক মারফতি সুফি ভাবনা : বাংলাদেশে বসবাসরত হিজড়াদের মধ্যে মাজারকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানের বেশ প্রভাব লক্ষ করা যায়।[২২] ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়, ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকদের আগমনের সাথে সাথে এখানে বিভিন্ন সুফি সাধু-সন্তদের আবির্ভাব ঘটেছে। সুফিবাদে বিশ্বাসী এসকল পীর কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোড়ামিমুক্ত থাকার কারণে এখানে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে ধর্মান্তর করা সহজ হয়েছিল। এমনকি তৎকালীন সময়ে তারা হিজড়াদের অন্যান্য মানুষের ন্যায় সমান মর্যাদা ও সম্মানের চোখে দেখতো। এর ফলে সুফি ধর্মের প্রতি হিজড়াদের এক বিশেষ দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে সুফিদের বিভিন্ন মাজার, পীরের দরগায় এদের উপস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং নিজেদের কল্যাণ ও পরকালের জন্য প্রার্থনার প্রচলন হয়। তারই ধারাবাহিকতায় হিজড়ারা রোগমুক্তি,

মানসিক শান্তি ও সুন্দরভাবে জীবন যাপনের জন্য আজমির শরিফ, বাসুবাটির মাজার, ঘটিয়ারি শরিফের মাজার, হাজি মালানের মাজারসহ বিভিন্ন মাজারে বার্ষিক ওরসে উপস্থিত হতে থাকে। এখানে সকল ধর্মের হিজড়া গভীর সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন উৎসব পালন করা শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন মাজার ও পীরের দরগায় ওরসে হিজড়ারা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, যেমন- খুলনার খান জাহান আলী (রাঃ)-এর মাজারে চৈত্র মাসের পূর্ণিমায় সে অঞ্চলের সকল হিজড়া একত্রিত হয়। এরপর মিলাদের মাধ্যমে সকলের শুভকামনা করে প্রার্থনা করে। প্রার্থনা শেষে সবার অনুদানের টাকায় (১০-২০ টাকা হারে) জিলাপি কিনে উপস্থিত সবার মাঝে বিতরণ করা হয়। এ ছাড়াও এরকম অনুষ্ঠান সাবানের চাঁদ, রজবের চাঁদ এবং শোকের চাঁদ মহররমেও করা হয়। শবেবরাত ও শবেকদরে তারা নিজের ঘরে কিংবা সম্ভব হলে মসজিদে গিয়ে প্রার্থনা করে। উল্লেখিত দিনগুলোতে তারা সাধারণত ঢোল নিয়ে বের হয় না।[২৩] এ সময় তারা ঘরে আগরবাতি জ্বালায়। তবে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশে বসবাসকারী হিজড়াদের যে মাজারের প্রতি বেশি দুর্বলতা দেখা যায় তা হল আজমির শরিফ। এখানে খাজা বাবার পবিত্র দরগাহে আরবি রজব মাসে যে ওরসপর্ব অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে হিজড়াদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

দেবী জননী (বহুচেরা দেবী) : হিজড়াদের মাঝে দেবী জননীর গুরুত্ব অনেক বেশি। দেবী জননী বা বহুচেরা দেবীতে বিশ্বাসী হিজড়ারা সাধারণত শৈবপন্থী। হিজড়াদের অনেকেই নিয়মিত বহুচেরা মাতার পূজা করে। বহুচেরা হলেন বন্ধ্যা, যৌন চেতনায় অক্ষম এবং লিঙ্গচ্ছেদীদের আরাধ্য দেবী। এই দেবীর মন্দির হিজড়াদের কাছে অতি পবিত্র হিসেবে বিবেচিত। প্রায় সকল হিজড়া নিজ জীবদ্দশায় অন্তত একবার এই মন্দির দর্শন করতে চায়। প্রতিবছর শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমায় এখানে বিশেষ উৎসবের আয়োজন করা হয়। দেশ বিদেশের অসংখ্য হিজড়া এই সময় এখানে আগমন করেন। এই দেবীর চারটি হাত রয়েছে। এক হাতে তলোয়ার, অন্যহাতে ত্রিশুল, তৃতীয় হাতে বই ও চতুর্থ হাত আশীর্বাদসূচক হিসাবে বিবেচিত, যার মাধ্যমে তিনি ভক্তদের আশীর্বাদ করেন।[২৪] অনেক সন্তানহীন নারী সন্তানকামনায় এই মন্দিরে প্রার্থনা জানাতে সমবেত হয়। হিজড়াদের মাঝে দেবীজননী বা বহুচেরা দেবীর পূজা করার পিছনে একাধিক লোককথা প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, বহুচেরা ছিলেন একজন সুন্দরী নারী। তিনি বনের মধ্যে দিয়ে কোন এক জায়গায় যাওয়ার সময় ডাকাতের কবলে পড়েন ও তাদের হাত থেকে সম্ভ্রম রক্ষার্থে নিজের দুস্তন কেটে ডাকাতদের দান করেন যার পরিণতিতে তার মৃত্যু হয়। এ স্থানেই পরবর্তীতে মন্দির গড়ে ওঠে এবং তিনি দেবীত্ব প্রাপ্ত হন।[২৫] হিজড়ারা স্তনহীন বহুচেরার সাথে তাদের দেহের সাদৃশ্য খুঁজে পায় এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তি প্রদর্শন করে। লোককথায় আরো প্রচলিত আছে যে, জনৈক রাজা বহুচেরার কাছে একটি পুত্র সন্তান কামনা করেন এবং তিনি তা লাভ করেন। কিন্তু সন্তানটি হয় পুরুষত্বহীন। তার নাম রাখা হয় 'জেঠো'। পরবর্তীতে বহুচেরা স্বপ্নে তার লিঙ্গচ্ছেদ করতে বলে এবং নারীর পোশাক পরিধানের আদেশ দেয় যা পুরোপুরি পালন করা হয়।[২৬] তাই হিজড়াদের ধারণা, দেবী বহুচেরার মাধ্যমে তারা লিঙ্গচ্ছেদের আদেশ পেয়েছে। যে কারণে হিজড়ারা বহুচেরার প্রতি যথেষ্ট অনুগত, শ্রদ্ধাশীল ও পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তাদের ধারণা, খোজাকরণের মধ্য দিয়ে বহুচেরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হয়; যার উপর হিজড়াদের সুখ, শান্তি ও পারলৌকিক কল্যাণ নির্ভর করে। তাই এই দেবীর আরাধনা না করে উপায় নেই।

এই মন্দিরের আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে, এখানে কোন সাধারণ পুরোহিত নেই। তবে দেবী বহুচেরার পরিচর্যার জন্য বেশ কিছু 'সেবায়েত' রয়েছে। এদেরকে 'পবয়া' বলা হয়। যে ব্যক্তি পবয়া হতে আগ্রহী তাকে সিবিলির (Cybele) পুরোহিত তথা গাল্লিদের (Galli) ন্যায় স্বেচ্ছায় পুরুষাঙ্গ ছেদন করে নপুংসক হতে হয় এবং এরপর সে পূজোয় দায়িত্ব পালন করে।[২৭] পবয়ারা হিজড়াকে স্বগোত্রীয় মনে করে। বর্তমানে এই মন্দিরের আশেপাশে অনেক ধর্মশালা গড়ে উঠেছে যার অধিকাংশের মালিক হিজড়া।

মঙ্গলামুখী : মঙ্গলামুখীর পূজা হিজড়াদের আচারবিধি অনুযায়ী শুভসূচক। এটা তাদের ধর্মের অঙ্গ।[২৮] এই পূজা সাধারণত বিয়ে এবং নবজাতকের আগমন উপলক্ষে শুভকামনা করার লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়।

নথভাঙ্গা অনুষ্ঠান : কোন রূপান্তরিত হিজড়া যেদিন প্রথম পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয় সেই মুহূর্তকে ঘিরে হিজড়াদের মাঝে দলগত আড্ডা উল্লাস সৃষ্টি হয়, যা মুহূর্তের মধ্যে বড় উৎসব বা অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। এ অনুষ্ঠান হিজড়াদের কাছে নথভাঙ্গা অনুষ্ঠান হিসাবে পরিচিত, যা সূদুর অতীত থেকে তাদের পূর্বপুরুষগণ পালন করে আসছে। নথভাঙ্গা অনুষ্ঠান হিজড়াদের কাছে নারীত্বের গর্বের সময়। এ অনুষ্ঠানে সকল হিজড়া সাধ্যমত সাজগোজ করে, মাথার চুলে ফুলের মালা ঝুলিয়ে একত্রে নাচানাচি করে ও ভালো খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করে। এখানে উল্লেখ্য যে, কোলকাতা ও বাংলাদেশের কিছু কিছু এলাকায় পতিতাদের যৌন অভিষেকের পর্বে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তার সাথে হিজড়াদের নথভাঙ্গা অনুষ্ঠানের যথেষ্ট মিল লক্ষ করা যায়।

ঢোল পূজা : হিজড়াদের জীবিকা অর্জনের অন্যতম উপায় হল গান-বাজনা করা, যার মূল বাদ্যযন্ত্র হল ঢোল। জীবিকা নির্বাহে ঢোল হিজড়া সমাজের মানুষকে সাহায্য করে বিধায় ঢোলকে দেবতাতুল্য জ্ঞান করে পূজা করা হয়।[২৯] ঢোলের প্রতি অসম্মান করলে ব্যবসা তথা জীবিকার ক্ষতি হবে এবং ঢোলের প্রতি ভক্তি প্রণাম তাদের দিন দিন অধিকতর স্বচ্ছলতার দিকে নিয়ে যাবে – এ বিশ্বাস হিজড়াদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে।[৩০] কালীপূজার রাতে হিজড়ারা ঢোলের আরাধনায় বসে। ঢোল পূজোর এই দিনে হিজড়ারা সাধারণত অত্যন্ত খোশমেজাজে থাকে। এদিন তারা বাহিরে কোন কাজে না গিয়ে নিজেদের বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। যেখানে পূজো হবে সেখানে বিশেষভাবে ঝাড়গোছ করা হয়। ঐদিন হিজড়ারা আমিষ জাতীয় খাবার গ্রহণ থেকেও নিজেকে বিরত রাখে। শিষ্যরা পূজোর বিভিন্ন উপকরণ যেমন- আতপ চাল, সুপারি, মাটির প্রদীপ, বাতাসা, ফল, ধুপ, মোমবাতি প্রভৃতি কিনতে বাজারে যায়। কিছু কিছু হিজড়া এদিন তোলা তোলে, তবে কেউ কেউ তোলা তুলে পূজো করাকে সমর্থন করেন না।

গুরুমায়ের তত্ত্বাবধানে শিষ্যরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নতুন শাড়ি পরে পূজার স্থানে পূজার উপকরণগুলি জড়ো করে। এই পূজা সাধারণত সন্ধ্যা ৭টার দিকে শুরু হয়। পূজামণ্ডপের দেওয়ালে অতঃপর তারা তেল-সিঁদুর দিয়ে মঙ্গলসূচক উর্ধ্ববাহু মানুষের তিনিট মূর্তি আঁকে। এখানে নতুন চামড়া লাগানো ঢোলগুলো সাজিয়ে রাখা হয়। উল্লেখ্য যে, ঢোল পূজায় সাধারণত পুরনো চামড়ার ঢোল আনা হয় না। তাই পূজার পূর্বেই ঢোলগুলোকে নতুন চামড়া দিয়ে হিজড়ারা ছেয়ে নেয়। প্রতিটি ঢোলের সামনে একটি করে পান পাতা থাকে যার উপর তেল-সিঁদুরের পাঁচটি ফোঁটা, একটি সুপারি, একটি বাতাসা ও আরও কিছু ফল রাখা হয়। এসব পান পাতায় নৈবেদ্যর সামনে একটি করে মাটির প্রদীপ রাখা হয়। স্থাপিত প্রদীপগুলোর মধ্যে মাঝখানের প্রদীপটি থাকে সবচেয়ে বড়। এই প্রদীপগুলোর পাশে একটি করে মোমবাতি রাখা হয়। পাশে গামলা ও ধামায় থাকে খই, কাটা ও গোটা ফল। এ রাতে হিজড়ারা প্রদীপ বা মোমবাতি দিয়ে বাড়ি আলোকিত করে। পূজোর বেদীতে সবগুলো প্রদীপ এবং মোমবাতি জ্বালানোর পর শিষ্যরা এক এক করে এসে সাজিয়ে রাখা ঢোলগুলিকে প্রণাম করে। সবার শেষে গুরুমা পূজোয় বসেন। তিনি দশ থেকে পনের মিনিট চোখ বুঁজে, হাত জোড় করে ধ্যানস্থ হয়ে ঢোলগুলির সামনে বসে থাকেন। তার ধ্যান শেষ হওয়ার সাথে সাথেই পূজো শেষ হয়। তবে এরপর আরও কিছু রীতিনীতি সম্পন্ন করতে হয়, যেমন– গুরুমায়ের কাছ থেকে ছড়ানো নারকেল নিয়ে একজন শক্ত-সমর্থ হিজড়া ঢোলের দিকে পিছন ফিরে নারকেলটি ভাঙ্গার লক্ষ্যে সজোরে ছুঁড়ে মারে। নারকেলটি আঘাত পেয়ে যদি না ভেঙ্গে থাকে তবে তা হিজড়াদের কাছে খুবই অমঙ্গলসূচক হিসেবে গণ্য হয়। এরপর গুরুমা শিষ্যদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করে। হিজড়ারা এ রাতে না ঘুমিয়ে নাচ-গানের মাধ্যমে কাটিয়ে দেয়। ভোর হলে হিজড়ারা মাটির বড় প্রদীপটি বাদে অন্য সব প্রদীপ, পান, পানের ওপর রাখা সুপারি, ফল ও অবশিষ্ট প্রসাদ (যদি থাকে) নিয়ে কাছের কোন পুকুর বা নদীতে ভাসিয়ে দেয়। এভাবেই হিজড়াদের ঢোল পূজার সমাপ্তি ঘটে।

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হিজড়া জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সমাজব্যবস্থায় আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি এবং লোকাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। এসকল রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে হিজড়া

সম্প্রদায়ের জীবনের বাস্তবতা ফুটে ওঠে। কেননা, সংশ্লিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি দীর্ঘকাল যাবৎ নানা অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বাস্তবতার আলোকে তাদের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। কাজেই সংশ্লিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি তাদের সাংস্কৃতিক জীবন ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলকে করেছে আরো সমৃদ্ধ। উল্লেখ্য, হিজড়াদের সংশ্লিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ঘটনার আলোকে সৃষ্ট ও প্রবহমান। ধর্মের উপর ভিত্তি করে হিজড়াদের মাঝে আচার-অনুষ্ঠান পালনে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা অভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে সংশ্লিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।

এই প্রবন্ধে হিজড়া সম্প্রদায়ের জীবনধারায় প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতিনীতি, লোকাচার ও প্রচলিত মূল্যবোধের প্রভাব ও গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় হিজড়াসমাজ মূলত আচার-আনুষ্ঠানকেন্দ্রিক একটি সমাজ গড়ে তুলেছে এবং এর ভিত্তিতে তারা তাদের জীবন-জীবিকা গড়ে তুলেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ সকল প্রথাগত রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এই সম্প্রদায়ের সদস্যরা বৃহত্তর বাঙালি সমাজের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হচ্ছে। অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট পশ্চিমা জীবনধারার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হওয়ার কারণে সমাজের ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি ও মূল্যবোধের প্রতি মানুষের আকর্ষণ হারিয়ে যাচ্ছে। আর এই পরিবর্তনের সার্বিক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সংশ্লিষ্ট হিজড়া সম্প্রদায়ের উপর। কারণ এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সদস্যরা প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও লোকরীতিসমূহের ভিত্তিতে নিজেদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতো, যা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে বৃহৎ সমাজের মানুষের পরিবর্তিত চাহিদার কারণে। তাই দেখা যায়, হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্যরা জীবিকার জন্য কোন স্থায়ী আয়ের উৎস পাচ্ছে না। কাজেই রীতিনীতি-নির্ভর হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্যরা বাস্তব কারণেই বিপথগামী হচ্ছে। অনেকেই জড়িয়ে যাচ্ছে নানা ধরনের অনৈতিক ও অপরাধপ্রবণ কর্মকাণ্ডে যা সামগ্রিকভাবে হিজড়াদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলছে। কাজেই বৃহত্তর সমাজ, সরকার, বেসরকারি সংস্থা, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের এগিয়ে আসতে হবে এই অসহায় সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখতে এবং সেই সঙ্গে সচেতন হতে হবে যাতে তাদের ঐতিহ্যগত জীবনধারা কোনোমতেই হারিয়ে না যায়।

তথ্যপঞ্জি

১। চৌধুরী আনোয়ারউল্লাহ ও রশীদ, সাইফুর : *নৃবিজ্ঞান : উদ্ভব বিকাশ ও গবেষণা পদ্ধতি*, প্রকাশক মনিরুল হক, বাংলা বাজার, ঢাকা ১২০৭

২। ইসলাম, সিরাজুল : *সেই সময়ের হিলি*, হিলিবার্তা, হিলি, দিনাজপুর, বাংলাদেশ, ১৯৯৫।

৩। Narrain, Siddarth: *Being A Eunuch*, Academic Publishers, New Delhi, India, 2003.

৪। অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু : *ভারতের হিজড়ে সমাজ*, প্রকাশক শ্রী শংকর মণ্ডল, বিধানসরণী, কলকাতা, ১৯৯৭।

৫। নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : *মৌর্যযুগের ভারতীয় সমাজ*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৫।

৬। অজয় ও বসু : পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ১৪৯।

৭। Vyas, M.D and Singala Yougesh: *The life Style of Eunuch* (1st ed.), Anmol publications, New Delhi, India, 1987.

৮। হুসাইন এস. এ. এম : *তৃতীয় প্রকৃতি : বাংলাদেশের হিজড়াদের আর্থ-সামাজিক চিত্র*, প্রকাশক, ষড়ঋতু, ঢাকা, ২০০৫।

৯। অজয় ও বসু : পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৪১।

১০। J. Troisi: *Tribal Religion, Religious Beliefs and Practices among the Santals*, South Asia Books, Columbia, 1979.

১১। A.D.W. *Malefijt : Religion and Culture: An Introduction to Anthropology of Religion*, The Macmillan Company, Newyork, 1968.

১২। J. Troisi: পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ১৫৫।

১৩। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর : *আচার-অনুষ্ঠান*; হেলাল উদ্দিন খান আরেফিন (সম্পাদিত), বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮৯।

১৪। হুসাইন এ. এস. এম : পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৩৯।

১৫। বেথ : *হিজড়া যৌন সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে কৌতূহলের পুনরুদয়*, উইকিপিডিয়া, ২০০৭।

১৬। অজয় ও বসু : পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৪৩।

১৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।

১৮। হুসাইন, এ. এস. এম : পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৮।

১৯। নীহার মজুমদার : *হিজড়া সমাজ-মানবিক অনুসন্ধান*, সাহিত্য প্রকাশ, বেহালা, কলকাতা, ২০০৫।

২০। অজয় ও বসু : পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৭৩।

২১। নীহার মজুমদার" পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৩৪।

২২। হুসাইন এ.এস. এম : পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৩০।

২৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১।

২৪। Nurrullah, R: *Life of Eunuch*, Madrash, India, 1990.

২৫। নীহার মজুমদার: পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৩৬।

২৬। অজয় ও বসু : পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৭৭।

২৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯।

২৮। নীহার মজুমদার : পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৩৬।

২৯। অজয় ও বসু : পূর্বে উল্লেখিত, পৃ. ৮১।

৩০। Dutta, Kaberi: *A Close Encounter with the Third kind*, The Telegraph, Calcutta, 1994.